‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ বদলের ইতিহাস

বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ হলো ‘বিজ্ঞান’। পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি এর সাথে আমাদের সবাই পরিচিত। তবে এখন যেই অর্থে বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করা হয় পূর্বে এরকম অর্থে এর ব্যবহার হতো না। তাহলে, কী অর্থে ব্যবহৃত হত? তাই আলোচনা করব এই লেখায়।

‘বিজ্ঞান’ শব্দটি কম করে হলেও ৩০০০ বছরের পুরানো একটি শব্দ। এই শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় বেদ, পুরাণ, উপনিষদে। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ লিখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। তাই ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যতম ভাষা ছিল সংস্কৃত। তামিল ভাষার পরেই সংস্কৃত (বৈদিক সংস্কৃত) হল আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম ভাষা। বেদ লিখা হয়েছে বৈদিক ভাষায়। আর এই ভাষাকে সংস্কার করে যে ভাষা তৈরি করা হয়েছিল তাকে সংস্কৃত ভাষা বলে। তাই ‘বিজ্ঞান’ শব্দের আদি প্রয়োগ উক্ত গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায়।

তবে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি কীভাবে অর্থ পরিবর্তন করতে করতে বর্তমান অর্থে এল বা আদৌ আদি অর্থ অক্ষুন্ন আছে কি না, এইটা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ নিয়ে সুকুমার সেন বলেন – “ ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি আধুনিক অর্থে ঠিক কবে চালু হ’ল তা জানবার কৌতূহল আমার আছে। শ্রীমান বুদ্ধদেবকে বলেছিলুম সে কথা। কিন্তু তিনি তা নির্ণোয় করতে পারেন নি।[…] বাংলায় ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত ব্যাপক অর্থে উনবিংশ শতাব্দের ষষ্ঠ দশক অবধি চলে এসেছিল। ” [১]

ভাষাবিদ সুকুমার সেন ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি কবে থেকে বর্তমান অর্থে প্রচলিত হলো তা নির্ণয় করতে পারেন নি। আমিতো দূরের কথা। তবুও নিজের কিছু ধারণা ব্যক্ত করব আর কী।

নিমোক্ত ৪টি ধাপে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।

১ম ধাপ (১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ- ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ): প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বলতে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ইত্যাদিকে বুঝানো হচ্ছে। আনুমানিক খ্রিষ্টপুর্ব ১৫০০ অব্দে বেদ লেখা হয় আর এর পর আসে পুরাণ, তারপর আসে উপনিষদ। ৪ টি বেদ , ১৮ টি পুরাণ, ২০০এর অধিক উপনিষদ রয়েছে, আর এ সবই বেদ কেন্দ্রিক। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে শুরু করে এই বেদ আর এর ব্যাখ্যা (পুরাণ, উপনিষদ) লেখা শেষ হয় আনুমানিক ৩০০ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ বেদের অন্ত হয় ৩০০ খ্রিষ্টাব্দে।

সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বমতে, ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি << বি + জ্ঞান >> এভাবে গঠিত হয়েছে। এইখানে ‘বি’ একটি উপসর্গ। ‘বিজ্ঞান’ শব্দের ‘বি’ উপসর্গের অর্থই মূলত ৪টি ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ,পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি আদি সংস্কৃত গ্রন্থে ‘বি’ উপসর্গের অর্থ ছিল ‘বিশেষ’। মূলত তখন ‘জ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞান’ দুটি শব্দ সমার্থকই ছিল। এই বিশেষ জ্ঞান ছিল ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরপ্রাপ্তির জ্ঞান। তাই ‘বি’ উপসর্গ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান, মোক্ষজ্ঞান, উপলব্ধিজাত জ্ঞান, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ইত্যাদি বুঝানো হতো।[২][৩]

উপনিষদসমূহ ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লেখা সমাপ্ত হয়েছিল। বেদের অন্তের পর ভারতবর্ষে এক নতুন দর্শনের আবির্ভাব ঘটে। আদি শঙ্করাচার্য এই দর্শনের জনক। তাঁর দর্শনের নাম ‘বেদান্ত দর্শন’। আদি শঙ্করাচার্য আনুমানিক ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে

মৃত্যুবরণ করেন।[৪] তাঁর প্রচারিত দর্শনের মূল কথা ছিল –এই জগতের যা কিছু আছে তা সবই মায়া। স্বপ্নে দেখা জিনিস যেমন অবাস্তব, তেমনি এই জগৎ অবাস্তব। আর আমরা এটাকে বাস্তব মনে করি কারণ আমরা মায়ার মধ্যে আছি। একমাত্র ঈশ্বরই হলো মূল বা আসল, আর বাকিসব ‘মায়া’ বা ‘অবিদ্যা’। তাঁর কথা কেন উল্লেখ করলাম তা একটু পরেই পরিষ্কার হবে। তিনি ‘ব্রহ্মসূত্র’ এর ভাষ্য রচনা করেন। সেখানে তিনি ‘বিজ্ঞান’ শব্দকে ‘নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি’ (= যেই জ্ঞান একদম নিশ্চিত , যাতে মায়া নাই) অর্থে ব্যবহার করেছেন ঈশ্বরজ্ঞানকে বুঝাতে। পরবর্তীতে আমরা দেখব কিভাবে এই অর্থ পরিবর্তিত হয়।

২য় ধাপ (৮০০খ্রিষ্টাব্দ- ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ): নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সংস্কৃত ভাষার একটি অভিধান রচনা করা হয় যার নাম ‘নামলিঙ্গানুশাসন’।[ক] এর রচয়িতা ‘অমরসিংহ’। অভিধানটি তাই ‘অমরকোষ’ নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করে। এই অভিধানটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, শোনা যায় প্রতিটি ছাত্রকে তা আত্মস্থ করতে হত।

এই অভিধানটিতে পাওয়া যায় ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি। তবে এইখানে ‘বি’ উপসর্গ দ্বারা ‘বিবিধ’ নির্দেশ করা হয়েছে। বিবিধ জ্ঞান হলো বিজ্ঞান। মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ আর বাদ বাকি জ্ঞান তথা শিল্পশাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদিকে ‘বিজ্ঞান’ বলা হয়েছে। সম্ভবত এই অভিধানই প্রথম যা ‘বি’ উপসর্গের এমন ব্যাখ্যা দিল।

যেহেতু সেকালে সকলেই অমরকোষ পড়েই বড় হতো, তাই প্রত্যেকেই এই ব্যাখ্যাই জানত। তারই লেশ ধরে মহাভারতের ‘গীতা’ অংশে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের ব্যাখ্যায় রামানুজ (১০১৭-১১৩৭) লিখেছেন – ভগবানবিষয়ক (ভগবদ্গীতা) জ্ঞান হলো ‘জ্ঞান’ আর বিবিজ্ঞাকার তথা ভগবদ্গীতার জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান হলো বিজ্ঞান।[২] রামানুজ দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তাই দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীতেও এই ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়।

এখানে একটা কথা বলা জরুরী। রামানুজ নিজেও ‘বেদান্ত দর্শন’ চর্চাকারী ছিলেন। তবে শঙ্করাচার্যের সকল মত তিনি গ্রহণ করেন নি। যেমন- শঙ্করাচার্যের মতে এ দুনিয়া মায়া হলেও রামানুজের মতে তা মায়া নয়। তাই রামনুজ যখন ‘বিজ্ঞান’ কে বিবিধ জ্ঞান বলছেন তখন তিনি ঈশ্বরভিন্ন জাগতিক জ্ঞানকে নির্দেশ করছেন।

৩য় ধাপ (দ্বাদশ শতাব্দী- অষ্টাদশ শতাব্দী): ‘অমরকোষ’, রামানুজের ব্যাখ্যার পর ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ আরো পরিবর্তিত হতে থাকে। এদিক দিয়ে শঙ্করাচার্যের ‘বেদান্ত দর্শন’ হয়ে উঠে জনপ্রিয়। আরো ভালোভাবে বলতে গেলে শঙ্করাচার্যের ‘অদ্বৈতবাদ’ সমাজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জগতকে বিবেচনা করা হয় মায়া হিসেবে। এদিকে ‘বিজ্ঞান’ অর্থ তখন ঈশ্বরভিন্ন জাগতিক জ্ঞান। এই দুয়ে মিলে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের ‘বি’ উপসর্গের অর্থ দাঁড়ায় ‘অসৎ’ বা ‘বিকার’ এ। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’ এ মুকুন্দরাম পূজা অর্চনার বিপরীত জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ আখ্যা দিয়েছেন।

“সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দশে   সঙ্গীত কবিত্ব-রসে

আসরে করহ অধিষ্ঠান

করো গো অঞ্জলি পুটে   উরহ আমার ঘটে

দূর কর দুর্মতি **বিজ্ঞান**।”[৫]

মুকুন্দরামের এই চরণে ‘বিজ্ঞান’ অসৎ জ্ঞানের রুপ নিয়েছে। মুকুন্দরাম নিজেও বেদান্ত দর্শনের অনুরাগী ছিলেন বলে মনে হয়, যেহেতু তাঁর কবিতার শুরুতেই বেদান্ত দর্শনের কথা আছে। শঙ্করাচার্যের সেই মায়া/অবিদ্যা তখন প্রযুক্ত হয় ‘বিজ্ঞান’ কে বুঝাতে।[খ] উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন অভিধানেও এই অর্থের দেখা মেলে।[৬] তবে তা প্রধান অর্থ হিসেবে ছিল না। ছিল গৌণ অর্থ হিসেবে। কেন গৌণ অর্থ হিসেবে ছিল তা ৪র্থ ধাপে আলোচনা করলাম।

৪র্থ ধাপ (উনবিংশ শতাব্দী-বর্তমান): ইংরেজরা এদেশে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। ধীরে ধীরে তারা এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করে, সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর শাসন শুরু করে। শিক্ষাবিস্তারেও তাদের ভূমিকা আছে। সংস্কৃত কলেজ, ফোর্ট উলিয়াম কলেজ ইত্যাদিতে তখন শিক্ষাচর্চা হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা-ইংরেজি অভিধানও তারা রচনা করে। সেই অভিধানগুলোতে ‘Scinece’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘বিদ্যা’, ‘বিজ্ঞান’ ব্যাবহার করা হয়।[৭] তাদের দেশের Science যা মূলত জড়বস্তুর জ্ঞান তাকে এই দেশে খারাপ অর্থে তো আর ব্যবহার করা যায় না, তাই একসময় ‘বিজ্ঞান’ জড়বস্তুর জ্ঞানকেই বুঝানো শুরু করল। আর ‘বি’ উপসর্গ ‘বিশেষ’ অর্থে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করল। এরই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-“ সমগ্র সত্যের আশপাশ দিয়া পরিস্ফুট জ্যোতি, রসায়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শাখা প্রশাখা সম্বন্ধীয় বৈশেষিক জ্ঞান তাই তাহার আদিতে ‘বি’”, অন্যত্র বলেন, “ বিশেষ বিশেষ শাখার পরিসমাপ্ত বিশিষ্টরুপ জ্ঞান” [৮] অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান’ এর ‘বি’ এর অর্থ দাঁড়ালো ‘বিশেষ’ কিন্তু জড়বস্তুর জ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান নয়। অদ্যাবধি একই অর্থে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি চালু আছে। আর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা অভিধানগুলোতে ‘বিজ্ঞান’ এর মুল অর্থ ‘বিশেষ জ্ঞান’ এবং তা জড়বস্তুর জ্ঞানকে নির্দেশ করে এরূপ করা হয় ইংরেজি অভিধানগুলোর অনুকরণে।

ছকঃ এক নজরে ‘বিজ্ঞান’ এর অর্থবদলের ইতিহাস

সময়কাল	**রচনাসমূহ**	**‘বি’উপসর্গের অর্থ**	**‘বিজ্ঞান’ শব্দের সামগ্রিক অর্থ**
১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ	বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, বেদান্ত	বিশেষ	ঈশ্বরজ্ঞান
৮০০ খ্রিষ্টাব্দ-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ	অমরকোষ, রামানুজের ভাষ্য	বিবিধ	ঈশ্বরভিন্ন অন্যজ্ঞান

১৩শ শতাব্দী-১৮শ শতাব্দী	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য	বিকার / অসৎ	জড়পদার্থের জ্ঞান
১৯শ শতাব্দী-বর্তমান	১৯শ শতাব্দীর অভিধানসমূহ	বিশেষ	জড়পদার্থের জ্ঞান

লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে যে, ‘বিজ্ঞান’ এর আদি অর্থে ও বর্তমান অর্থে ‘বি’ উপসর্গের অর্থ একই আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন (বা বিপরীত) ক্ষেত্রে প্রয়োগ হচ্ছে। আদিতে যেই জ্ঞানের কদর ছিল উচ্চে সময়ের পালাবদলে সেই জ্ঞানই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আর যেই জ্ঞানের তেমন কদর ছিল না, তা পেয়েছে সেই উচ্চ সম্মান।

মোটামুটি এই হলো ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ বদলের ইতিহাস।[গ]

নোট

(ক) 'অমরকোষ' এর রচনাকালঃ 'অমরকোষ' অমরসিংহের রচনা। কিন্তু অমরসিংহ ঠিক কত সালে জন্মগ্রহণ করেন বা কোন সময়ের মানুষ তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু, প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ ড.বাসুদেব বিষ্ণু মীরাশি তাঁর 'Literary and Historical Studies In Indology' গ্রন্থে অমরকোষকে 'ধনঞ্জয়' এর লেখা 'নামমালা' অভিধানের পরে লেখা হয়েছে বলে মনে করেন। আর 'নামমালা' রচনাকাল ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ- ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ এর মধ্যে বলে মনে করেন। তাই অমরকোষ ও অমরসিংহ কে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী বলে প্রস্তাব করেন।

বিস্তারিত পড়ুনঃ Literary and Historical Studies In Indology, Chapter-05, page-50-52

(খ) অনেক ইতিহাসবিদের মতে ভারতবর্ষে একসময় বিজ্ঞানচর্চার চল ছিল। কিন্তু, হঠাৎ কেন এই চর্চা বিলীন হয়ে গেল সেই বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দায়ী করেছেন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ/অদ্বৈতবাদ কে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁরই অনুসরণ করেছেন।

এছাড়া, রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত ভাষা, বেদান্ত দর্শন (শঙ্করাচার্যের) এর সমালোচনা করেন আর বলেন যে এইসব শিক্ষা আমাদের তরুণ প্রজন্মের উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। এর বিপরীতে তিনি ম্যাথামেটিক্স, ন্যাচারাল ফিলসফি, কেমিস্ট্রি, এনাটমি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় 'সায়েন্স' শিক্ষা করার প্রস্তাব দিয়ে লর্ড আমহার্স্ট এর নিকট চিঠি লেখেন ১৯২৩ সালে।

বিস্তারিত পড়ুনঃ ১। History of Hindu Chemistry, Vol I, page-195 footnote

২। ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পরিচ্ছেদ-৫, পৃষ্ঠা-১৬০-১৬৯

৩। The Great Indian Education Debate: Documents Relating to the Orientalist-Anglicist Controversy, 1781-1843, page-110.

(গ) 'বিজ্ঞান' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিত মতিলাল শাস্ত্রী 'भारतीय दृष्टि से विज्ञान शब्द का समन्वय' (ভারতীয় দৃষ্টি থেকে বিজ্ঞান শব্দের সমন্বয়) নামের গ্রন্থ হিন্দি ভাষায় রচনা করেন। এই গ্রন্থে ' বিজ্ঞান' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অন্যভাবে। সেখানে 'বিজ্ঞান' শব্দের 'বি' উপসর্গের ৩ টি অর্থ তথা- বিশেষ, বিবিধ, বিরুদ্ধ – উল্লেখ করা হলেও তাঁর তত্ত্বমতে 'বিরুদ্ধ' অর্থ হবে না। কারণ, বিরুদ্ধ জ্ঞান বুঝাতে আলাদাভাবে 'অজ্ঞান' শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই 'বিজ্ঞান' এর সম্ভাব্য ৩টি অর্থের মধ্যে ২টি অর্থ বাস্তবে ব্যবহৃত হতো। তথা, বিশেষ জ্ঞান ও বিবিধ জ্ঞান। এই ২ টি অর্থের

মধ্যে সমন্বয় করেছেন এভাবে- কীভাবে অসীম, অখণ্ড শক্তি (ঈশ্বর) বিভিন্ন/বিবিধভাবে এই জগতে প্রকাশ পায় তা হলো 'বিজ্ঞান'। আর এই নানাবিধ প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও, এই বহুত্ব থাকা সত্ত্বেও সকল কিছুই যে একই সূত্রে বাধা, এক এর মধ্যে নিহিত- এটি হলো 'জ্ঞান'। তাই 'বিজ্ঞান' যেমন বিশেষ জ্ঞান, তেমনি বিবিধ জ্ঞানও।

তবে এই অর্থ বেদের ক্ষেত্রে খাটালেও, বিরুদ্ধ জ্ঞান/অসৎ জ্ঞান এই অর্থেও যে একসময় ব্যবহৃত হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুনঃ ১। **भारतीय दृष्टि से विज्ञान शब्द का समन्वय** (ভারতীয় দৃষ্টি সে বিজ্ঞান শাব্দ কা সামানভে) পৃষ্ঠা-১১

২। অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে মতিলাল শাস্ত্রীর ছাত্র ঋষি কুমার মিশরা এর বই 'The cosmic matrix' এ।

রেফারেন্স

[১] বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

[২] বিশ্বকোষ- ১৮ তম খণ্ড, 'বিজ্ঞান' ভুক্তি, পৃষ্ঠা-৫৩৬ দ্রষ্টব্য।

[৩] 'বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ-১ম খণ্ড' পৃষ্ঠা-১১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৪] i) বিশ্বকোষ – ২০ তম খন্ড পৃষ্ঠা – ১৫০ দ্রষ্টব্য। এখানে শঙ্করাচার্যের জন্ম ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তা প্রমাণ করা হয়েছে।

ii) Encyclopedia Britannica এ শঙ্করাচার্যের মৃত্যু ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫] চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন পৃষ্ঠা -২,৩৮৭

বি.দ্র. 'সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থে ভিন্ন পাঠের উল্লেখ আছে। 'দূর কর দূর্গতি কুজ্ঞান'। তবে সুকুমার সেনের পাঠ অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ জানতে 'চণ্ডীমঙ্গল' এর 'ভূমিকা'অংশ পড়ুন।

[৬] যেমন- সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান (১৮৬৬)

[৭] যেমন- A Companion to Johnson's Dictionary in English and Bengalee, Jhon Mendies (1822);

A Dictionary of Bengalee Language, William Carey (1825).

[৮] বাঙ্গালা ভাষার অভিধান-২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৬৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ ১৮তম খণ্ড) ২০তম খণ্ড , (১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ)১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ ।(

২। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ২য় খন্ড২য় সংস্করণ। ,

৩। রামকমল বিদ্যালঙ্কার , সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান চতুর্থ সংস্করণ। ,

৪। সুকুমার সেন, চণ্ডীমঙ্গল (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ)।

৫। ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ)।

৬। ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য, অদ্বৈতবাদ-বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড , ২য় সংস্করণ।

৭। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পঞ্চম সংস্করণ।

৮। Jhon Mendies, A Companion to Johnson's Dictionary in English and Bengalee,1st edition (1822).

৯। William Carey, A Dictionary of Bengalee Language 2nd volume(1825).

১০। Encylopedia Britannica (2015)

১১। Vasudev Vishnu Mirashi, Literary and Historical Studies in Indology, First edition.

১২। Prafhulla Chandra Ray, History of Hindu Chemistry Vol I, Second edition.

১৩। Rishi Kumar Mishra, The Cosmic Matrix, First edition.

১৪। মতিলাল শর্মা , भारतीय दृष्टि से विज्ञान शब्द का समन्वय (১৯৫৬)।

নামঃ সাকিব সিকদার।